Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 21–29
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল : নারী মনস্তত্ত্ব ও আধুনিকতা

দিলরুবা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : kdilruba91s@gmail.com

Keyword
চণ্ডীমঙ্গলে নারীচরিত্র, নারী মনস্তত্ব, আধুনিকতার লক্ষণ, সম্ভাবনা।

Abstract
কবিকঙ্কণচণ্ডীর অভিনবত্বের কথা বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন- মানব চরিত্র সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অভিনব। এই জন্যই তাঁর কাব্যের মধ্যে সুপরিণত চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। সত্যই মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের বাস্তব রস জীবনানুভূতি, চরিত্রচিত্রণ ও সমাজচিত্রণ এত সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিয়েছেন। নারী চরিত্রের অভিনবত্বের কথা বলতে গিয়ে ড.হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন- নারী চরিত্রগুলি প্রায় সবই সুঅঙ্কিত হয়েছে ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা,দুর্বলা দাসী ফুল্লরার সখী বিমলা ও লহনার সখী লীলাবতী কেউই অস্পষ্ট নয়, কেউই গতানুগতিক নয়। খুল্লনার জননী রম্ভাবতী চিরন্তনী বাঙালি জননী। এই চরিত্রগুলির অন্তঃকরণের সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত কবি দক্ষতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন। দু-একটি ভদ্র চরিত্র ছাড়া বাকি চরিত্রগুলি সবই কবির সহানুভূতির জীয়নকাঠির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

Discussion
কবিকঙ্কণের আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক থেকে তার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ডিহিদার মাহমুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি সাত পুরুষের বাসস্থান দামুন্যা পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আড়রা গ্রামের পালধি বংশজাত ব্রাহ্মণ বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন-

"ধন্য রাজা মানসিংহ   বিষ্ণুপদাম্বুজ ভঙ্গ
গৌরবঙ্গ উৎকল অধিপ।
যে মানসিংহের কালে   প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ।।"[১]

এই বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের সভাসদ রূপে এবং তারই অভিলাষে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর প্রসিদ্ধ চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেন।

কবিকঙ্কণ তার কাব্য মধ্যে নিজের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন :

"মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাহ চন্ডির আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।"[২]

তার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র। পিতা হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র। সম্ভবত এই কবিচন্দ্র উপাধি, নাম নয়।

কবির প্রকৃত নাম নিয়েও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন কবির প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম বলে জানালেও সুকুমার সেন জানিয়েছেন কবির প্রকৃত নাম মুকুন্দ। কেননা তাঁর মতে রাম সংযুক্ত মুকুন্দের কোন প্রমাণ নেই। কবিকঙ্কণ তার উপাধি, মুকুন্দ তার নাম এবং চক্রবর্তী তাঁর কৌলিক পদবী। এক্ষেত্রেও সুকুমার সেন ভিন্নমত পোষণ করেছেন- "কবিকঙ্কণ উপাধি নয়। উপাধি হইলে দাতার উল্লেখ অবশ্যই কোন না কোন ভণিতায় থাকিত। এটি স্বয়ংগৃহীত উপনাম।"

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে প্রচলিত হলেও আসলে এই কাব্যের নাম অভয়ামঙ্গল। অনেক সময় একে কবিকঙ্কণ চণ্ডীও বলা হয়।আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমূখ পণ্ডিতগণ মনে করেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের রচনা শেষ হয়েছিল মানসিংহের শাসনকালে অর্থাৎ ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চারটি অংশ রয়েছে- বন্ধনাংশ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখন্ড, নরখন্ড তবে নরখন্ডের কাহিনীকে কবিকঙ্কণ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন আখেটিক খন্ড বা ব্যাধ খন্ড এবং বণিক খন্ড।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের বন্ধন অংশে রয়েছে গণেশ, সরস্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মী, শ্রীরাম, চণ্ডী, শুকদেব, শ্রীচৈতন্য বন্দনা এবং দিগবন্দনা তাছাড়া আছে মঙ্গল দেবী প্রার্থনা। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গঠনের আদর্শে রচিত হয়েছে। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ দেবখন্ড মুকুন্দের কাব্যে শুরু হয়েছে সৃষ্টিপালা দিয়ে। সেখানে প্রথমে আদিদেব স্মরণ আছে। মুকুন্দ দেবখন্ডে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনে লৌকিক জীবন রসের আয়োজন করেছেন দারিদ্র অভাবজনিত সমস্যা কে কেন্দ্রে রেখে।

মঙ্গলকাব্যের চতুর্থাংশ অর্থাৎ নর খন্ডের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিকঙ্কণ চণ্ডীর এই অংশকে আরও দুটি অংশে ভাগ করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নর খন্ডের আখেটিক খন্ডে অভাব ও দরিদ্র জনিত সমস্যা ক্ষণিকের জন্য বহন করে এনেছে সতীন সমস্যাকে কিন্তু বণিক খন্ডের সতীন সমস্যাই রয়েছে কেন্দ্রে। প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি ঘনীভূত ও আবর্তিত হয়েছে পরিবার জীবনকে কেন্দ্র করে।

মনসামঙ্গলে দেব খণ্ড ব্রাহ্মণ এবং নর খন্ডে রয়েছে বণিক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দেব খণ্ডে ব্রাহ্মণ, আখেটিক খন্ডে রয়েছে অন্ত্যজ ব্যাধ এবং বণিক খন্ডে রয়েছে ধনী অভিজাত এবং বণিক ধনপতি। মুকুন্দ কাব্য ঐতিহ্যে এই তিনটি সামাজিক স্তরের কাব্যিক প্রকাশের সম্পূর্ণ সফল। সব শ্রেণীর বর্ণের বর্গের মানুষ নিয়ে চণ্ডীমঙ্গলের কবির কারবার।

ফুল্লরা কালকেতুর ধর্মপত্নী। কালকেতুর বিয়ের পরই ফুল্লরার শ্বশুর-শাশুড়ি কাশী চলে গেছে। ফুল্লরা ও তার স্বামী দুজনের সংসার। কালকেতু সারাদিন পশু শিকার করে মৃত পশুর ভার নিয়ে অপরাহ্নে বাড়ি ফেরে। ফুল্লরা যত্ন করে স্বামীর জন্য রান্না করে রাখে। স্বামীর সাড়া পেয়েই সে স্বামীর আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে -

"দূর হইতে ফুল্লরা বীরের পেয়ে সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণ চামড়া।।
মোচা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।
ঝাটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।।"[৩]

শুধু গৃহকর্ম সেবা নয় ফুল্লরা মাংসের পসরা নিয়ে হাটে বিক্রি করতেও যায়। শাকপাতা তুলে উদারান্নের ব্যবস্থাও করে। ফুল্লরার প্রকৃত পরিচয় সে স্বামী সোহাগিনী। সংসারের অভাব দরিদ্র সে হাসিমুখে সহ্য করে। ঘরে খাবার না থাকলে সখীর বাড়ি থেকে ক্ষুদ ধার করে আনে। নয়তো শাকপাতা ফলমূল খেয়ে থাকে। নিজের দুঃখ দারিদ্রের জন্য সে অদৃষ্টকে নিন্দা করেছে, নিজের বাপ-মাকেও দোষ দিয়েছে। কিন্তু কখনো স্বামীকে দোষী করেনি -

"বড় ভাগ্য মনে গনি বড় ভাগ্য মনে গনি।
কতশত জোঁক খায় নাহি খায় ফনি।।"[৪]

এই দুঃখের মাঝেই ফুল্লরার সুখ তার স্বামীকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বামীকে অধিকার করতে তার ঘরের দরজায় চণ্ডী যখন টোকা দিয়েছে তখনই। ফুল্লরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নানাভাবে সে এই সুন্দরীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছে - সে শুনিয়েছে পুরান কাব্য, বর্ণনা করেছে বারো মাসের দুঃখ কথা। বারো মাসের বিবরণী পেশ করার পরেও যখন দেবী বলেন 'থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ'। তখন ফুল্লরার ক্রোধ ও অভিমান গিয়ে পড়ে কালকেতুর ওপর-

"পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।"[৫]

এবং এরপর কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই ফুল্লরা আবার বলে -

"বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।।"[৬]

বলা বাহুল্য ফুল্লরার এই উক্তি তিরস্কার নয় বরং এর পেছনে রয়েছে অনুরাগ,চোখের জলেই তার প্রমাণ রয়েছে।

সুতরাং ফুল্লরা যে স্নেহে, মমতায়, ভক্তি-শ্রদ্ধায়, সেবায়, পরিচর্যায়, ঈর্ষায়, বিদ্বেষে, অভিমানে ও আশঙ্কায় এক জীবন্ত নারী হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

লহনা বাঙালি ঘরের অতি সাধারণ বধূ। কোন বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখক তার চরিত্রে অংকন করেননি। লহনা ধনপতির প্রথম স্ত্রী। প্রথম জীবনে সে যথার্থই স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিল। অন্যান্য নারীর মতো সেও স্বামীর সোহাগের ভাগ দিতে নারাজ। যখন সে শুনলো যে তার স্বামী তারই ভগ্নী রূপসী খুল্লনাকে বিবাহ করতে চাইছে, তখনি তাকে নিদারুণ অভিমান গ্রাস করেছে-

"লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমান ভরে রামা না দেয় উত্তর।।"[৭]

কিন্তু চতুর ধনপতি শাড়ি আর গহনা দিয়ে অভিমানিনী লহনার চিত্র জয় করে নিয়েছে।যে কোন সাধারন রমণীর মতই শাড়ী গহনা ও মিষ্টিবাক্যে বশীভূত হয়েছে। পাঁচপল সোনা, পাটশাড়ী পেয়েই ধনপতিকে বিবাহের অনুমতি দিয়েছে।

"রত্ন পায়্যা যত্নে নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।"[৮]

লহনা সাদাসিধে সরলা প্রকৃতির। খল, কপটতা, কটু বুদ্ধি তার মধ্যে নেই। বাণিজ্য যাত্রাকালে ধনপতির লহনার হাতে খুল্লনাকে অর্পণ করে জননীর মমতায় পালন করতে অনুরোধ জানিয়েছে। লহনা সেজন্য পরম স্নেহে সযত্নে খুল্লনার পরিচর্যা করেছে-

"দুই সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্দ
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা"[৯]

কিন্তু দাসী দুর্বলা দুই সতীনের সখীত্ব সহ্য করতে পারল না। তারই কুমন্ত্রণায় লহনার বুকে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষানল জ্বলে উঠলো। শুরু করলো খুল্লনার প্রতি অত্যাচার। সখী লীলাবতীর সাথে পরামর্শ করে ধনপতির নির্দেশিত জাল চিঠি দেখিয়ে মারধর করতেও দ্বিধা করেনি সে। আবার এক সময় দৈব নির্দেশে লহনা খুল্লনার বিবাদ মিটে গেছে। তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছে। খুল্লনাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে -

"বৈর ভাব না ভাবিও মনে।
যার সনে বারোমাস একত্র করিবে বাস
অবশ্য কোন্দল তার সনে।।"[১০]

সপত্নী কোন্দলের বিচিত্র গতি, ঈর্ষা বিবাদ, মান-অভিমান, মানভঞ্জনের মধ্যে দিয়ে খুল্লনা লহনা চরিত্র দুটি প্রাণময়ী বাস্তব নারীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

খুল্লনা ধনপতি দ্বিতীয় স্ত্রী। সে অপরূপা সুন্দরী পরিপূর্ণ যুবতী এবং রসিকা। ধনপতি পলাতক পায়রা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য খুল্লনা শরণাপন্ন হলে ধনপতির সঙ্গে পরিহাস করতে ছাড়ে না সে-

"ঈষৎ হাসিয়া রামা করে পরিহাস।
পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড়ো আস।।
আজিকার মত ছাড় মোর অনুরোধ।
আপনাআপনি সাধু করহ প্রবোধ।।"[১১]

খুল্লনা নিতান্ত নির্বোধ নয়। বিয়ের পর সে তার বড় বোন তথা সতীন লহনার অনুগত হয়েই ছিল। কিন্তু সেও ধীরে ধীরে সতীন বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়ে। ধনপতির নামে লেখা চিঠিখানা সে জাল বলেই গ্রহণ করেছে। লহনা তার উপরে দৈহিক উৎপীড়ন শুরু করলে সেও নিরবে সহ্য করেনি। নিজে দূর্বলা হলেও সে লহনার অত্যাচারের উত্তর দিতে অগ্রসর হয়েছে-

"চুলোচুলি দোঁহে অঙ্গনেতে করে।
চেয়ে রহে সবে নিবারিতে নারে।।"[১২]

কিন্তু লহনার শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে খুল্লনাকে বাধ্য হয়ে লহনার আদেশ মেনে চলতে হয়েছে। খুলনা ছাগরক্ষণ স্বীকার করেছে-

"এমন শুনিয়া রামা দুয়ার ভারতী।
ছাগরক্ষণে তবে দিল অনুমতি।।"[১৩]

মহামায়া চণ্ডী যখন কানন মধ্যে খুল্লনাকে বর দিতে চাইলেন, খুল্লনা তখন সুকৌশলে নিজের মনোভাবটি ব্যক্ত করেছে-

"পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব বহুধন আছয়ে ভান্ডারে।।"[১৪]

শ্রীমন্তের জন্মের পর শিশুর অভিভাবক হিসেবে খুল্লনার অবদান যথেষ্ট। পিতার অবর্তমানে শ্রীমন্তের যথার্থ অভিভাবিকা রূপে সে সমস্ত কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। বাৎসল্যময়ী জননী হিসেবে খুল্লনা এই পর্বে অতুলনীয়া।

খুল্লনা চরিত্রে কিছু কিছু অলৌকিকতা আছে, তবুও চরিত্রটিতে বাস্তব মানবীয় সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা অভিমান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

দুর্বলা দাসীর চরিত্রটি রামায়ণের মন্থরার চরিত্রের আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু মন্থরার সঙ্গে পার্থক্যও রয়েছে প্রচুর।লহনার প্রতি দুর্বলার সহানুভূতি থাকলেও দুই সতীনের ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখার উদ্দেশ্যেই সে লহনাকে উত্তেজিত করেছে। দুই সতীনের ভাব তার মোটেই সহ্য হয় না -

"দুই সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে হইল তার কালকূট জ্বালা।।"[১৫]

দুর্বলাও যেন নারদ ঠাকুরের ভূমিকা নিয়েছে। সে নিছক কোন্দল বাধানোর উদ্দেশ্যেই লহনাকে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। কেননা তাঁর মতে -

"যেই ঘরে দুই সতীনে না হয় কোন্দল।
সেই ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।।"[১৬]

খুল্লনার গর্ভাবস্থায় দুর্বলা তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছে। খুলনার সাধভক্ষণের কাজ দুর্বলাই সমাধা করেছে। শ্রীমন্তের জন্মের পর আনন্দিত হয়ে নবজাতকের ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে হাসিমুখে। শ্রীমন্তের ঠিকুজি নির্মাণ করার জন্য গনককে ডেকে এনেছে। আবার মাতা পুত্রের কথোপকথনের সময় কিংকরীর মত ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এসে শ্রীমন্তের পা ধুইয়ে দিয়েছে দুর্বলা।

সুতরাং দুর্বলা শুধু খল বা চতুরা নারী নয়, সে একজন সাধারণ নারীও বটে। কবিকঙ্কণ তার ছলচাতুরি সাজসজ্জা, বেসাতি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা যেমন চিত্রিত করেছেন, তেমনি তার প্রভুভক্তি, মমতা, কর্মদক্ষতাকেও বাস্তবায়িত করেছেন।

কবিকঙ্কণ জীবন রসিক কবি। সর্বোপরি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ছিল তার নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। আর সেই শক্তি বলে চরিত্রের খুঁটিনাটি দিককে তুলে ধরে তাদের সমস্যা ও মানসিকতাকে নিপুণভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।যে সমস্যায় জর্জরিত ছিল নারীমন, ফলে তাদের চিন্তায়-চেতনায় মননে দেখা দিয়েছিল এক ভিন্নধর্মীতা যা তাদেরকে ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর রূপে গড়ে তুলেছিল। এই শ্রেণীর চরিত্রকে,তাদের সমস্যাকে রূপ দিতে কবিকঙ্কণ আদৌ কার্পণ্য করেননি। আর সে কারণেই বণিক খন্ডের কাহিনীতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে সপত্নী সমস্যা বারোমস্যার মতো ঘটনা এবং লহনা খুল্লনার মতো চরিত্রের মনস্তত্ত্ব।

লহনা ধনপতির প্রথম পত্নী। খুল্লনাকে ধনপতি দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে চান। এই সম্বন্ধে খুল্লনা বা রম্ভাবতীর সায় নেই। কারণ তিনি যে একজন নারী হয়ে সতীনের ঘরে মেয়েকে ঘর করতে পাঠাবেন কি করে? স্বামীকে বলেন-

"খুল্লনা বান্ধিয়া গলে মরিব গঙ্গার জলে
নাহি দিব দারুন সতীনে।"[১৭]

এর কারণ হিসেবে রম্ভাবতী বলেছে-

"নাহিক মধুর কথা যে ঘরে লহনা সতা
ভেবে দেখ যেন বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণী।।"[১৮]

এ যেমন রম্ভাবতীর মনস্তত্ত্ব, অন্যদিকে ভাবী সতীনের আগমনে লহনার মনস্তত্ত্বকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন কবিকঙ্কণ। লহনা দুর্বলাকে বলেছে -

"কানে তোর দিব হেম চিন্তহ আমার ক্ষেম
যেমতে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায়।"[১৯]

যে জায়গায় তার একমাত্র অধিকার সেই অধিকার ভাগ সে অন্যজন কে দেবে কেন?-

"শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন
আঁখিজল নিবারিতে নারি।
এ শেল রহিল মনে স্বামী দিব অন্যজনে
সঞ্চয় করিয়া ঘরবাড়ি।।"[২০]

কিন্তু ধনপতির নারী মনস্তত্ত্ব জানা ছিল বলেই লহনাকে বশ করে বিবাহের অনুমতি আদায়ে কোন কষ্ট হল না তার-

"রত্ন পেয়ে যত্নে নিল লহনাযুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।।"[২১]

কবিকঙ্কন লোকজীবনের নিপুন রূপকার। তাই দুই সতীনকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যাতে সমস্যা বেশি করে ঘনীভূত হয়। এক্ষেত্রে তিনি নারী মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাটিকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন।লহনা বিগত যৌবনা বন্ধ্যা নারী এবং সেজন্য সমাজে তার অমর্যাদা। কিন্তু তারই সতীন যৌবনবতী সন্তানসম্ভবা। এই সমস্ত কারণে লহনার মনে সৃষ্টি হয়েছে হীনমন্যতাবোধ বা 'Infiriority Complex'।

লহনার হীনমন্যতাবোধকে মূলধন করে সপত্নী সমস্যাকে আরও প্রকট করে দেখিয়েছেন কবিকঙ্কণ। কেননা মানুষের হীনমন্যতাবোধ মানুষকে অসৎ কাজে লিপ্ত করে তাকে গড়ে তোলে প্রতিশোধপরায়ন চরিত্ররূপে। লহনার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

শুধু বণিক খন্ডে নয়, ব্যাধ খন্ডের বিভিন্ন চরিত্রে বিশেষত ফুল্লরার চরিত্রেও নারী মনস্তত্ত্বকে অপরূপ রূপ দান করেছেন কবিকঙ্কণ। তাই সতীন সন্দেহে সে দেবীকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। সতী নারীর আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান দিয়েছে এবং নিজের বারো মাসের দুঃখ কষ্টের অতিরঞ্জিত বিবরণী দেবীর কাছে পেশ করেছে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নারীর মনোবাসনা ও অভিনয় নৈপুণ্য ধরা পড়ে যায়।

বারোমাসের বিবরণী পেশ করার পরেও যখন দেবী বলেন- 'থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ'। তখন ফুল্লরার ক্রোধ ও অভিমান গিয়ে পড়ে কালকেতুর উপর -

"পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।"[২২]

ফুল্লরা পুনরায় বলে-

"বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী।।"[২৩]

বলাবাহুল্য, ফুল্লরার এই উক্তি তিরস্কার নয়, বরং এই বিদ্রুপ ভাষণের পেছনে রয়েছে অনুরাগ, চোখের জলে তার প্রমান রয়েছে।

কবিকঙ্কণের আধুনিক মন ও জীবনবোধের গভীরতা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারায় তাকে সজীবতা দিয়েছে। এই সজীবতার মূলে রয়েছে কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট অনন্যতা, তার সৃষ্ট চরিত্রের অবিস্মরণীয় বিশিষ্টতা।

এই অভিনবত্ব ও আধুনিকতার স্বরূপ কবির কাব্যে কতখানি তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সমালোচক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"কাব্যটির আধার তৈরি হয়েছে দেবী চণ্ডীকে ঘিরে, আর আধেয় হচ্ছে সজীব বাঙ্গালীর গৃহ জীবন। ...চণ্ডীমঙ্গলের আকর্ষণ কাব্যটিতে পরিব্যপ্ত বাঙ্গালীর জীবনরসের জন্যে। এখানেই মধ্যযুগের কবি হয়েও মুকুন্দ স্বতন্ত্র। এটি যে জীবনকে নানা কোণ থেকে দেখা যায়, জীবনের উষ্ণতাকে উপলব্ধি করা, রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা - এখানেই কবির আধুনিকতা।"

আধুনিক জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। কবি মুকুন্দের কাব্যেও আধুনিক জীবন সুলভ নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা কিংবা কৌতূহলের নিপুণ প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। ছদ্মবেশী দেবীকে ঘিরে ফুল্লরা ও কালকেতুর মনে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে তাতে রয়েছে অভিনবত্ব। যেমন ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর উক্তি -

"হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে যাব স্থানান্তরে।।"[২৪]

আধুনিক জীবন সমস্যার মতো সামাজিক সমস্যা মুকুন্দের কাব্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। যেমন সতীন সমস্যা মধ্যযুগের একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা, যা চিত্রিত হয়েছে কালকেতুর বক্তব্যে -

"শাশুড়ি ননদি নাহি নাহি তোর সতা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।।"[২৫]

পতি সোহাগিনী নারী ফুল্লরা স্বামীর কাছে নিসপত্ন অধিকার যখন চায়, ফুল্লরা তখন শুধু মধ্যযুগের নারী হয়ে থাকে না, হয়ে যায় আধুনিক রমনী,যে সব কিছুর বিনিময়ে স্বামী সোহাগে কাউকে অধিকার দিতে চায় না। সংসার দুঃখের হোক, সংসারে দারিদ্র যন্ত্রণা থাক, তাতে কোন ক্ষতি নেই, যদি তার স্বামী একমাত্র ফুল্লরাকেই স্ত্রী বলে মনে করে। তাই ফুল্লরার বারোমাস্যার অংশটি কবিকঙ্কণের কাব্যে নিছক বারো মাসের দুঃখের পাঁচালী না হয়ে তা হয়ে উঠেছে আধুনিক নারী ফুল্লরার মানসিকতার প্রতিফলন -

"স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী যে পরম ধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা।।"[২৬]

কবিকঙ্কণের বাকভঙ্গির বিশিষ্টতা তার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বকে সূচিত করে। উজ্জ্বল শাণিত মার্জিত বাকভঙ্গি প্রয়োগে কবিকঙ্কণ অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার হাতে গভীর ভাবের ভাষা হয়ে উঠেছে সহজ-সরল। মনস্তত্ত্বের অতিসহজ উপযোগী ভাষা ফুল্লরার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় -

"হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূরে গেল ক্ষুধা-তৃষ্ণা রন্ধনের ত্বরা।।"[২৭]

মনস্তত্ত্ব নির্ভর চরিত্রচিত্রন কবিকঙ্কণের আধুনিকতার অন্যতম দিক। চরিত্রের আঁতের কথাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ ধনপতির কাহিনীতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পরিচিত চরিত্রসমূহ কবিকঙ্কণের প্রতিভাস্পর্শে অভিনব হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সহানুভূতি ছিল বলেই কবি চরিত্রের মনের গহনে ডুব দিয়েছেন এবং চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও শাশ্বত রূপ দিতে পেরেছেন। তাই দুর্বলা দাসী যেমন রামায়ণের মন্থরার নব সংস্করণ আবার তেমনি আধুনিক যুগের ঠকচাচার দোসর এবং হীরা মালিনীর পূর্বসূরী। লহনাও জীবন্ত চরিত্র। বিগতযৌবনা বন্ধ্যা নারীর মনস্তত্ত্বকে যেভাবে লহনার মধ্যে কবিকঙ্কণ রূপ দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনব। খুল্লনার প্রেম-ভালোবাসা ধৈর্য সহনশীলতা যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে খুল্লনা একজন অসহায়া অত্যাচারিতা নারীর প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছে। চণ্ডীর প্রতি খুলনার এই উক্তিতে-

"পুত্র বর চাব কিবা স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব ধন বহু আছয়ে ভান্ডারে।।"[২৮]

এখানে নারীর মর্মকথাটি অকপটে ব্যক্ত হয়েছে। সত্যিই তো নবপরিণীতা বধূর কাছে স্বামী নেই- এর চেয়ে বড় আক্ষেপ আর কি হতে পারে? তাই নারীর পুত্র বর কামনা, অলংকার কামনা তার কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে। সেজন্য খুল্লনা দেবীর কাছে যে বডর চায় তার মধ্যে বাঙালি নারীর ঐকান্তিকতা, ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত হয়।যেমন -

"যদি বর দিবা মাতা সেবক বৎসলে।
অনুক্ষণ রহে মন তব পদতলে।।"[২৯]

ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিকতা আধুনিক সাহিত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা কবিকঙ্কণের কাব্যে বর্তমান। কবি নিজে জীবনে দুঃখ পেলেও কাব্যে তার কোন দুঃখবাদের পরিচয় নেই। কবি ও দুঃখবাদী নন। খুল্লনার ছাগ চরানোকে কেন্দ্র করে খুল্লনার যে রূপ এঁকেছেন তাতে কবির নৈর্ব্যক্তিকতা স্পষ্ট। যেমন-

"চোরা ছাগল সব চারিদিকে ধায়।
কুটিল কুশের কাঁটা রক্ত পড়ে পায়।।"[৩০]

কিংবা খুলনার উপর লহনার অত্যাচার বর্ণনায় কবির নিরাসক্ত চিত্তের পরিচয় -

"দুঃখে না ভুঞ্জয়ে রামা চক্ষে বহে জল।
কোপেতে লহনা চক্ষু করিল পাকল।।"[৩১]

লহনার অত্যাচার চরমে উঠলেও খুল্লনা নির্বিকার, তদ্গত চিত্ত। তাই -

"হৃদে বিষ মুখে মধু পাপ মতি বাঁঝি।
অবশেষে বড়ো সরা ভরে দিল কাঁজি।।
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী।
তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী।।"[৩২]

এই বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন অসহায়া রমণীর করুণ রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি জীবন রসিক কবির উপলব্ধি গভীরতা তথা নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিও পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

সুতরাং, কবিকঙ্কণ মধ্য যুগে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই দেবমাহাত্মমূলক কাব্য রচনা করতে বসেও তিনি চিরন্তনত্বের কথা ভুলে যাননি বলেই তাঁর কাব্যের মধ্যে অভিনবত্ব তথা আধুনিকতার পরিচয় রেখেছেন এবং মঙ্গলকাব্যের ধারায় শ্রেষ্ঠ কবির আসনটি বজায় রেখেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩১
২. তদেব,
৩. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৩

৪. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৪
৫. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৫
৬. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৫
৭. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৭
৮. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৭
৯. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৩৭
১০. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪০
১১. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪২
১২. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪৪
১৩. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪৫
১৪. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪৬
১৫. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪৮
১৬. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪৮
১৭. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৪৮
১৮. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৫৩
১৯. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৫৪
২০. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৫৭
২১. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১০৩
২২. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১১৪

২৩. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৩২
২৪. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৩৪
২৫. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৩৪
২৬. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৩৬
২৭. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১০৭
২৮. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৫৪
২৯. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৫৬
৩০. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৫৮
৩১. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৬১
৩২. ভট্টাচার্য শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপখ্যান, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১৯, পৃ. ১৬১